অন্ধকার লেবুবন

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ / ৬ আশ্বিন ১৩৬৭ ॥ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
দিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
নীতিশ মুখোপাধ্যায়

সূচী

মীনাক্ষী ও শক্তিকে

এই লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ :

র‍্যাঁবো ভের্লেন এবং নিজস্ব

আহত ভ্রূবিলাস

না নিষাদ

কোথায় সেই দীর্ঘচোখ

মৌরীর বাগান ও কিছু নতুন কবিতা

দুরূহ আঁধার লেবুবন

শিল্প কি স্বেচ্ছায় যায়, যাবে ?
          সে তো কক্ষনো যাবে না।
খিড়কির আড়ালে মুখ গোঁজ করে বসে থাকবে ;
                    ডাকো—
আয় সোনা, এখানে রোদ্দুর দেবো, বাতাবি লেবুর বল, খেলা,
চলে আয়,
যাবে না সে।
ওর চোখে বিশুদ্ধ সন্দেহ, নখে মাটি,
গর্দানে নির্বোধ হিংসা—
খিড়কির আড়াল থেকে একচুল নড়বে না।
কোলে নিলে পিছলে যাবে ; গলায় বকলশ ধরে টানো
ছিঁড়ে যাবে কণ্ঠনালি।
          শিল্প এত সহজে নড়ে না।

ওর জন্যে চাই ধূর্ত বিড়ালীর সস্নেহ দস্যুতা
যা ওকে তড়িৎ-বেগে মুখে ধরে শূন্যে তুলে নেবে
মাছের টুকরোর—না, না, নিজের শিশুর মতো।
                    তারপর
প্রকাণ্ড নিঃশব্দ লাফ :
          কুয়োতলা, পাঁচিল, ছাইগাদা পার
দুরূহ আঁধার লেবুবন।

সেখানে ও বড়ো হবে নিরঞ্জন কাঁটার আদরে॥

সংগত্

কপালে রক্তচন্দন, অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র
শিল্পীর ডানপাশে ওস্তাদ
বসেছেন সুর ও সময়ের বিজ্ঞানী।

আঙুলে ভেঙে-ভেঙে সময়কে বসাচ্ছেন
কাচের পাত্রে বরফের টুকরোর মতো,
কখনো ছুড়ে দিচ্ছেন দূরে—
উড়ে যাক,
আবার লুফে নিচ্ছেন ক্ষিপ্রহাতে জব্দ পাখিটাকে।

ওই তো ঘোড়ার পিঠে এক দল নর্তকীর প্রবেশ
ও নৃত্য—
এবং অন্তর্ধান।

কিষেণ মহারাজ বাঁ-হাতে ফেলে দিলেন মুহূর্ত,
আবার ডান হাতে কুড়িয়ে নিলেন,
তেহাই।
সুরের মধ্যে সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কিছুক্ষণ,
জেগে উঠলো চন্দ্রার্কপরিধি॥

কেন তুমি

কেন তুমি হঠাৎ ক্ষমার শিক্ষা ভুলে গেলে ?
এত ক্রোধ
ভালো নয়, নেহাত নির্বোধ, সে-ও জানে।
কেন তুমি কণ্ঠ থেকে যজ্ঞ-উপবীত ছিঁড়ে ফেলে
ভাসালে গঙ্গায় ?

যা কিছু তোমার পাশে যায় আসে
সবই তার তোমার রচনা, ইচ্ছাধীন ?
তা তো নয়।
একা তুমি কতটুকু পারো ?
আছে ধারে-কাছে ঢের অপ্রিয় আত্মীয় প্রতিবেশী
সম্ভবত পরার্থবিদ্বেষী, হীনমন্য, কিন্তু তুমি তাই বলে
ক্রোধী হবে, আরো ক্রোধী হবে ?
মানুষ কী অনন্য বিষণ্ণ জীব
কী পরনির্ভর
তুমি পূর্বেও দেখেছ, দেখ নাই ?

তবে কেন হঠাৎ ক্ষমার শিক্ষা ভুলে গেলে ?
কেন তুমি কণ্ঠ থেকে যজ্ঞ-উপবীত ছিঁড়ে ফেলে
ভাসালে গঙ্গায় ?

গভীরে মন্থর শোল

বুকের ওপরে ব্রিজ তুলে দাও
নিচে থাক্ জল,
কিছু বুদ্বুদ চঞ্চল,
গভীরে মন্থর শোল একান্ত প্রহরী।

পিচ্ছিল শরীরে চিহ্ন অলাতচক্রের,
পুচ্ছে তার
অলস নৃত্যের ভঙ্গি,
উন্মীলিত চোখে
জননীর বিস্মিত উদ্বেগ।

বুকের ওপরে ব্রিজ, শব্দ বহে যাক
নিচে থাক্ জল,
গভীরে মন্থর শোল একান্ত প্রহরী॥

পরমান্নের বাটি

শিউড়িতে এই সেদিন এক সাঁওতাল বালিকা
মেলার মধ্যে জেগে উঠলো—মাথায় শাদা পরমান্নের বাটি,
তাই না দেখে মেলা ভাঙলো, আকাশে সব জানলা গেল নিবে
গৃহস্থেরা ছুটে ফিরলো বাড়ি :
অন্ধকারে জেগে রইলো লজ্জাহীন বিশাল বালিকাটি।

ওরা বললো, চাঁদ,
মেলার মধ্যে কবি-ধরার ফাঁদ :
আমরা, যারা শহুরে লোক, বালিকাটিকে ফুসলিয়ে আনলাম,
জেনে নিলাম রাত্তিরা তার নাম—
তারপর এক ভেলার মতো ভাসতে লাগলো
অনুচ্ছিষ্ট পরমান্নের বাটি ॥

কলকাতায় ফেরা

বেশ কিছুকাল পরে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হোল।
প্রথমটা আপনি তো ঠিক চিনলেন না, একটু ভ্রূ বাঁকিয়ে
তাকালেন—
বান্ধবী পরস্ত্রী হলে যেমন অবজ্ঞা মেশা স্নেহ ছুড়ে দেয়।

"মনে পড়ে, চার-পাঁচ বছর আগে—" ইত্যাদি না ব'লে
ভাববাচ্যে প্রশ্ন করি : যাওয়াটা হচ্ছিল কোন্‌দিকে ?
"মনে পড়ে, চার-পাঁচ বছর আগে—" ইত্যাদি না ব'লে
শান্তভাবে আপনিই বললেন :
দাঁত পড়ে গেলে ফের দাঁত ওঠে।

এ সব হেঁয়ালি আমি আজকাল বুঝি না,
তবু, তর্কের খাতিরে
বললাম, "হ্যাঁ শিশুদের।"
অমনি গন্‌গন্‌
ট্রাফিক বাতির মতো রেগে
চৌচির রাস্তার মতো ধমকিয়ে আমায়
বললেন : "সত্যিই, আমি চিরকাল শিশুর মতন ভুলোমন ॥"

তোমার প্রেরণা তুমি

প্রাণ ধরে যা দিতে পারে নি
দিতে গিয়ে সরিয়ে নিয়েছে হাত,
শিল্পকে তা দিতে হবে।

সম্মুখে ছড়ানো বর্ণমালা,
সাজানো দুরূহ অঙ্ক প্রাণে ও অপ্রাণে,
শিল্পী হতবাক।

স্রষ্টাই বলেছে :
ফরাশ বিছানো ওই, শতরঞ্জ, দ্যূত
তুমি খেল,
রূপের ভিতরে রূপ তুমি খুঁজে নাও।···
দিতে গিয়ে সরিয়ে নিয়েছি হাত
প্রাণ ধরে যা দিতে পারি নি তুমি নিজে নেবে ব'লে
দেখি পারো কিনা ;
হৃৎপিণ্ড রমণ করে স্তন,
হাড়ের ভিতর থেকে ক্ষীর।

শিল্পীর শাণিত চক্ষু বিদ্ধ করে স্রষ্টার শরীর॥

স্নান

—কেন তুমি ইদানীং ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছ ?
—শীত আসে।
—কেন তুমি ক্রমাগত আমার নাগাল থেকে
সরে যাচ্ছ দূরে ?
—শীত এলো।

—শুধু শীত ?
নিজের কৌটোয় বসে একাকী সাবান
নড়ে ওঠে।
ভেজা মানুষের জন্যে তার লোভ, সর্বকাম
অস্নাত হাওয়ায় ফাটে। তবু
মানুষ কি প্রশ্ন করে, সাবান, তোমারও অভিমান ?

ছুটিতে

ছুটিতে কোথায় যাচ্ছ ?
দেরাদুন ?
চারদিকে আগুন।
যাও কোনো পাহাড়ে, ঠাণ্ডার দেশে
যেখানে মেঘের সঙ্গে মেশে
শিলা।

শীলা বুঝি বান্ধবীর নাম ?
তা হলে তাকেও সঙ্গে নাও,
ডায়মণ্ডহারবার ছাড়া সে বেচারা গিয়েছে কোথাও !

মানুষ

মানুষ কখনো বাঁচে মানুষের জন্যে
কখনো বা
বাঁচার আনন্দে, নিজে,
রৌদ্রে পুড়ে অথবা বর্ষায় ভিজে
খেয়ে কিংবা একদম না-খেয়ে যে-রকম।

বকম্ বকম্ গায় গোলা পায়রা
রকম-সকম দেখে পাখি
'কোথায় কোথায়' ডাকে কাক—
ওরাও যেমনটি আছে থাক, আমরা প্রাণবন্ত থাকি
যত দিন
ব্যক্তিগত মৃত্যুর প্রত্যাশা
আছে
আর আছে আমাদের
অপভ্রংশ, বুদ্ধিহীন ভাষা ॥

ও যদি স্বেচ্ছায়

এখনও শরীরে শান্ত ঢেউ লেগে আছে।
দু'পাশে চাষের ক্ষেত মধ্যখানে অম্লান আলপথ,
মানুষ আসে নি তার কাছে
মানুষ আনে নি রথ,
রথচক্র কোমরে ফেলে নি নোংরা দাগ।
পাশ ফিরে শুয়ে আছে কেমন নির্লিপ্ত
শুয়ে থাক।

ও যদি স্বেচ্ছায় উঠে বসে,
পেয়ারার গন্ধমাখা গ্রীবা তুলে চায়,
ও যদি পাখির মতো স্বচ্ছন্দে ওদিকে উড়ে যায়,
আমি ওকে ছন্দ শেখাবো না॥

বৃন্দা মাসী

একটি পাগল লেখে এবং আর-এক পাগল ছাপায়,
দুজন মিলে রহস্যময় কলকাতাকে কাঁপায়।
বৃন্দা মাসী কলকাতা যে ; সত্যি কাঁপে না সে,
গামছা পরে' জর্দা মুখে খিলখিলিয়ে হাসে।
এমন অনেক ভূমিকম্প তারুণ্যে প্রত্যহ
আনাভিনিতম্ব জুড়ে জাগাতো দুঃসহ
ব্যথা। এখন ঘুমোয় তারা মেদের লেপে ঢুকে—
একটি পাগল ছাপায় তবু আর-এক পাগল লেখে।

বাহান্ন লাখ মূঢ় পড়ে সেই লেখা ঘাড় গুঁজে—
মা গো, কোথায় এনু, কেন পাইনে তোমায় খুঁজে ?
সরস্বতী বলেন, ওরে পাগল ছেলে—পাগল
না হলে কেউ খুলতে পারে শেষ দরোজার আগল !

যে আছে সিংহের বামপাশে

কে কে ওই তিনটে কুকুর
বসে থাকে সিংহদরোজায় ?
কে আদেশ করলে তেড়ে আসে
কে আদেশ করলে ফিরে যায় ?

একজন যম, ওকে চিনি—
জীবনের অঙ্গাঙ্গী শরিক
গৃহে থাকে, পর্বতচূড়ায়।
দ্বিতীয়টি শত্রুর প্রতীক ?

কৌতূহল অন্যটিকে নিয়ে
যে আছে সিংহের বামপাশে,
সে কি দুঃখ,—তোমার প্রণয়ী
ডাকার পূর্বেই চলে আসে ?

বিলম্বে মন্‌সুন

দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে দু'টি মাস
আকাশের আড়ালে কম্বলে গা ঢেকে
ওত পেতে ছিলেন মন্‌সুন ;
আটুই জুলাই মধ্যরাত্রে তিনি অতর্কিতে সমরে নামলেন।

ঘোড়ার খুরের উৎক্ষিপ্ত ধুলোয় ভরে গেল রাজধানী
রাজধানীর অনেক উত্তপ্ত কোটর ;
সারি-সারি প্রহরী বৃক্ষেরা
একে-একে ধরাশায়ী হোল, ঘর্মাক্ত মানুষ
ও অন্যান্য প্রাণীরা বৃষ্টির প্রহারে জর্জর
ও পলাতক মাটির গহ্বরে।
সমস্ত রাত যুদ্ধ ক'রে, জিতে, মন্‌সুন অন্য দেশে পাড়ি দিলেন

অনেক ছোট-ছোট কলহ ও তিক্ততা
ঘামাচির মতো বিরক্তিকর অনেক যন্ত্রণা ও বিদ্বেষ
ভুলে গিয়ে—পরের দিন, ন'ই জুলাই সকালে
এক দল পরাজিত তৃপ্ত ঠাণ্ডা মানুষ
আততায়ী মন্‌সুনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় উপরে চোখ মেললো।

হয়তো সমস্ত কল্যাণ আসে মধ্যরাত্রে এমনই অদ্ভুত ছদ্মবেশে ॥

মানুষ বদলায়

দেখেছ আজকাল যাকে ভালোবাসা দু'দিকে ছড়ানো,
সিঁথির দুপাশে চুল, যেমন
হৃদয়ে চৈতন্যে বিভাজিত ?

২

পৃথিবীর মতো নারী, নিজের আমিষগন্ধে প্রীত,
রেখেছে উষ্ণার্দ্র ক'রে বিষুব অঞ্চল।
কিন্তু অকারণ—তাই নয় ?
কোথায় সাম্রাজ্যলোভী বর্বর বীরের দল
মনোযোগী পরস্বাপহারী
সম্ভোগে প্রস্তুত ?

মানুষ বদলায়, সে তো জানি।
কিন্তু মানুষের কষ্ট, ক্রোধ, আশা, নির্বোধ যাতনা
সবই তো একাগ্র আছে, শুধু
ভালোবাসাটুকু তার দ্বিধাগ্রস্ত—দু'দিকে ছড়ানো,
বাঁকা সিঁথি, সিঁথির দু'পাশে পাতা চুল
মধ্যখানে প্রখর নখের চিহ্ন রাখে নি বিশ্বাস॥

আমরা কে—কীভাবে

আসলে সবাই ছুটছে, অর্থাৎ পালাচ্ছে : ধাবমান
কোনো গন্তব্যের দিকে নয়।
যেন পিছনে কোথাও
ছুরি চলছে, অসহ্য ধোঁয়ার মধ্যে বন্দুকের গুলি :
যেন ঠেলাঠেলি ভিড়ে
অদৃশ্য শত্রুর হাত পকেট হাতড়াচ্ছে, যেন
গলা বুক কব্জি থেকে ছিঁড়ে নিচ্ছে গোপন সম্পদ।
কিংবা ভেবে নিন
রাস্তার মাঝখানে একটা বোমা ফাটলো, সেই শব্দ শুনে
ছুটলো সব, অর্থাৎ পালালো, লেংড়ে ঘষ্‌টাতে ঘষ্‌টাতে
যেদিকে দু-চক্ষু যায়।—এমনি এক ছবি।

আপনি যে নিবিষ্ট মনে কাজে ডুবে আছেন ; এবং
আপনার আত্মীয়—যিনি প্রাতিস্বিকতায় মগ্ন, ঘুমে,
কিংবা শিল্পে কবিতায় :
অলৌকিক সুস্থতার দিকে হয়তো আপনার বন্ধুটি
টানছেন : তিনিও
আপনারা সবাই কিন্তু আসলে ছুটছেন তপ্ত কেন্দ্র থেকে
কেন্দ্রহীনতার দিকে—বৃত্তাকার
ছড়িয়ে যাচ্ছেন দূরে সুশীতল।
কল্পনা করুন—
বিশ্বের গলিত নাভি ফেটেছে হঠাৎ
যা দেখি নি, কিন্তু তার শব্দটা শুনেছি,
শ্রবণ মাত্রই ভয়ে যাত্রার আসর থেকে ছিট্‌কে ঊর্ধ্বশ্বাস
দৌড়তে লেগেছি—একা
একটা দল, দিগ্বিদিক :   এমনি কোনো ছবি।

আমরা কে কীভাবে ছুটছি সেইটেই দ্রষ্টব্য, দৃশ্য,
আসলে তো কোথাও যাচ্ছি না॥

ফাল্গুন

আমি তো তোমাকে চিনি।
তুমি সব বালিকার কাতর শরীর
ছুরিকাঘাতের মতো বিঁধে দাও,
উহাদের বেদনাকে দীর্ঘদিন ঝরে যেতে দাও
বাম চোখ দিয়ে।
আমি তো তোমাকে চিনি।
তুমি হাতবোমা হয়ে মুহুর্মুহু ফেটে যাও
ম্লান নাবালিকাদের খোলা বারান্দায়—
এই তোমার আদর!

তুমি আসছ আততায়ী—ক্রূর, হিংস্র, সুযোগসন্ধানী
ওরা না জানুক, আমি দেখেছি ওদের, আমি জানি॥

রাষ্ট্রপতির বাগানে

কলাবতীগুচ্ছ আছে নানারঙ পৃথক পৃথক
কমলা ও সিঁদুর, হলুদ—সবুজের মাথায় তবক,
গাছ নয় বৃক্ষও নয়, লোকে জানে ঘাসের শরিক
প্রজাপতি বসলে মাথায় ফুল ফাটে তড়িক-ঘড়িক।

"ফুল নয় ওরা ফুল নয়"—ওই উঁচু জানলা থেকে
বললেন রাষ্ট্রপতি গম্ভীর গলায় হেঁকে—
"মাঝ রাতে জ্যোৎস্না হলে ঝকঝকে রাস্তাগুলো
কার্পেট বিছিয়ে ঢাকে মানুষের পায়ের ধুলো ;
ঝিনঝিন বাজনা বাজায় একজন ম্যাজিকওলা
কলাবতীগুচ্ছে জাগায় কী দারুণ হাওয়ার দোলা !
ওই ফাঁকা জায়গা জুড়ে আমি দেখি হাজার হাজার
প্রজাপতি উড়ছে,—যেন নানারঙ পাখির বাজার।

"ফুল নয়, ওরা ফুল নয় ! দিনমানে ঘাপটি মেরে
বসে থাকে, জ্যোৎস্না হলে উড়ে যায় বাগান ছেড়ে।
রেগে-মেগে হঠাৎ যদি ডেকে উঠি, সেপাই সেপাই,
ওরা বলে, রাষ্ট্রপতি, নেমে এসে যোগ দেবে ভাই ?"

নিচু হতে হতে

নিচু হতে হতে মাথাটা ছুঁয়েছে পা
আর কতো নিচু হবো ?
মানুষের পাশে মানুষ দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ ছোঁবে না
হৃদয় হবে না দ্রব,
এ কেমনতরো জীবন ? এমন জীবন ফিরিয়ে নাও
আমি ফিরে যাই ফের
প্রাচীন শরীরে শুক্রের মতো ; গোপন যন্ত্রণাও
শুকিয়ে বেঁচেছে যে প্রবল বৃদ্ধের।

না হলে তোমার পা দুটি আঁকড়ে
দশটি নখের থেকে
ছিঁড়ে নেবো যতো প্রণাম হয়েছে জমা,
যে মাথা নোয়ায় শ্রদ্ধায়, তা-ই ঘৃণার ভস্ম মেখে
যদি ফুঁসে ওঠে, অকারণ, কোরো ক্ষমা ॥

পোল্ট্রি

মোরগ বললো, 'আগে শুনি—তার ডিম
তা দেবে কোথায় ?   বাচ্চাটা হবে কার ?
নাকি ডিমটাই উঠে যাবে কারো প্লেটে ?'

'কার প্লেট ?   সে কি সিদ্ধ খাবে, না ভাজা ?
শাদা না হলুদ ?   নাকি দুটি ভাগ ফেঁটে
লবণ এবং লংকার রক্তিম
মিশিয়ে করবে ওটি সদ্ব্যবহার ?'

'কেন সে-ই খাবে ডিমটা, অপরে না।
কেন অমলেট ?   সিদ্ধ তো সুস্বাদু।
তা ছাড়া প্রশ্ন :   কেন এই ভ্রূণনাশ ?
পৃথিবীর আলো কেড়ে নেয় কোন্ রাজা ?'

'উত্তর চাই'—মোরগ বললো, 'আছে ?
না পেলে কিছুতে যাবো না প্রিয়ার কাছে !'

সে কি যাবে ?

সামনের শিরীষগাছটা সিমেণ্টে পা গুঁজে
প্রত্যহ দোলায় মাথা—সম্ভাষণ,
ফুল ফোটায় বিশেষ সময়ে।
গ্রীল-দেয়া বারান্দা, লাল মেজে, তার ওপরে দাঁড়ালে
কুড়ি বর্গফুট নীলাকাশ।
রোঁ-ওঠা পাপোশ, শাদা ঘরের দেয়াল
ইতস্তত খসা চুন ;
খোলা জানলা দিয়ে ঠিক সুযোগমতন
ঢোকে মশা, শীতের বাতাস, বিল্লি, প্রতিবেশীদের ধূর্ত চোখ।
এ-বাসায় কত দিন ?
তা হোল তিরিশ কিংবা চল্লিশ বছর।

এবার নতুন বাসা দেখতে হয় ; নাকি
অন্য পাড়াতেও এই অব্যয় রুটিন ?
তার চেয়ে
গায়ের চামড়াটা খুলে যদি
উল্‌টো করে পরা যেতো,
জীবনের দ্বিতীয়ার্ধ এক বাসাতেই থাকতে বিরক্তি হোত না।
সে কি যাবে ?

দুই নারী

মৌরলা মাছের মতো চক্ষু ছিল
অস্বচ্ছ কষ্টও ছিল তাতে।
নিশ্ছিদ্র নাকের পাটা, চূর্ণ চুল
কানের লতিতে ছিল হীরা,
নখাগ্রে অভ্রের মতো চিকচিক করছিল দাবি তার-
নারীকে দিতেই হবে পূর্ণ অধিকার,
দিতে হবে।

নিয়ে গেল বিনাযুদ্ধে।

অথচ নিচেই, পথে, অপ্রশংসিত ভগ্নী তার
দু'হাতে পতাকা ধরে হাঁটছিল মিছিলে।
কেন, সেই জানে। তারও দাবি
অভিন্ন, যদ্যপি দুটি চোখ
মৌরলা মাছের মতো অস্বচ্ছ ছিল না,
কানের লতিতে হীরা, চূর্ণ চুল,
নখাগ্রে অভ্রের দ্যুতি—কিচ্ছুই ছিল না।

দু'হাতে পতাকা ধরে হাঁটছিল নীরবে,
তার দেহ
ঘর্মাক্ত, ঠোঁটের প্রান্ত ঈষৎ বিদ্রোহী,
তার রূপে
মুগ্ধ নয় বলে পুরুষেরা
কিচ্ছুই ছিল না॥

ইচ্ছে ঝরে পড়ে যায়

দেখ, কী সহজে লোকটা তুলে নিল লেবু,
কী ভীষণ নির্বিকার তার দুটি আঙুল ঘোরানো !
ও যেন পরের নারী, লেবু নয়, যেন
ফোঁটা-ফোঁটা ইচ্ছে ঝরে পড়ে যায়
মধ্যেকার দুর্গগুলি থেকে ।

"তোমার অভ্যেস আছে"—আমি বলি,
"আঙুলও ভেজে না !
তুমি কি প্রোষিতভার্য, দীর্ঘকাল আছ
দীর্ঘকাল এ ক্রূর শহরে ?"

মন্দিরেই যাবে

প্রাসাদ করেছে তুচ্ছ, তার পাশে নগণ্য মন্দির।
সন্ধ্যায় কাঁসর বাজে, শঙ্খ ডাকে : কোথায় দেবতা ?
নগ্নচিত্র থেকে উঠে রঙিন সম্পর্ক পিছে ফেলে
এসেছে নৈবেদ্য হাতে নিজে নারী—শিল্পের সমিধ ;

অসামান্য সে দেবতা—প্রিয় ও সমান অসহায়,
শিল্পীর মতন তার নখে নেই রক্তের ফোয়ারা,
সে দেখে চোখের কান্না, শোনে স্থির দুঃখের কাহিনী
অথচ আনন্দ প্রেম বেদনা সে দিতে কি সক্ষম
সেই ভাবে ?

নারীরও প্রার্থিত আর কিছু নেই, সমর্পণ আছে,
মৃত শিলাখণ্ডে শান্তি—শীতলতা, উপেক্ষা, বিস্মৃতি ;
ব্যথার শরীর নিয়ে আর কোথা যাবে সে-অভাগী ?
দেবতা অশক্ত, ক্লীব। মন্দিরই তো একান্ত নির্ভর !

তিনটে শালিক

সাত সকালে ঘুম-চোখে ফুল তুলছে তিনটি মেয়ে।
জলের মতো কথা বলছে—নতুন-শেখা কোনো গোপন কথা,
আমি আসতে চুপটি, যেন থমকে থামে তিনটে চোরা শালিক,
সাজি ভরতি সন্তহৃত মাধবী, জুঁই এবং কলরব।

ওদের মধ্যে নীল-জামাটা একটু দিদি, তাকেই ডেকে বলি :
"সন্তফোটা ফুলগুলোকে ছিঁড়লি কেন তোরা ?
ওদের বুঝি কষ্ট হয় না—"
"গাছের আবার কষ্ট !"—বলে নিচের ঠোঁট ছড়িয়ে উলটিয়ে
আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকায়,
যেন গাছের দিকে।

এবার আমি সত্যি রেগে গেলাম।
নীল জামাকে বলি :
"কেমন লাগে যদি তোমার সন্তফোটা কুঁড়ি—
এমনি করে ছিঁড়ি দু-নখ দিয়ে ?"
"কী অসভ্য"—ব'লে হঠাৎ তিনটে চোরা শালিক
আমাকে ভুল বুঝে
পালিয়ে গেল পাঁচিল টপ্‌কিয়ে॥

আমি এখনো জানি না

আমিও প্রথমবার মন্দিরের দরোজা পর্যন্ত
গিয়েছি মাথায় নিয়ে এক ঝুড়ি ফল
ভক্তের সম্বল, দিতে দেবতার হাতে—
ফলের ভিতরে ছিল গোপন দুঃখের মতো কীট,
আমি সেই কীটমুগ্ধ ফল নিয়ে গিয়েছি মন্দিরে।

দেবতার দেহরক্ষী পূজারী ছিলেন বসে নামাবলী গায়
কপালে চন্দন। হাতে উদ্ভাসিত প্রদীপশিখায়
দেখালেন বিগ্রহের মুখ,
দেখালেন শিরে তাঁর উজ্জ্বল কিরীট ;
আমার ঝুড়ির মধ্যে ফল আর গোপন দুঃখের মতো কীট
তিনি ফিরিয়ে দিলেন।

মন্দিরে কোথাও ঠিক দেবতা আছেন!
আমি তাঁর ঘণ্টাধ্বনি শুনে, তাঁর গন্ধ পেয়ে
দরোজা পর্যন্ত—
কিন্তু কই ?···
বিগ্রহের মধ্যে তিনি ?
বিমুখ পূজারীটির চক্ষুপ্রান্তে ?
অথবা ফলের মনে গোপন দুঃখের মতো কীট হয়ে
লুকিয়ে ছিলেন ?
আমি এখনো জানি না।
শুধু জানি, আমি আর মন্দিরে যাবো না কোনোদিন॥

নালিশ

তখনও ট্রেনের কিছু দেরি আছে দেখে
আমি বিরক্ত হয়েছি
মিথ্যে এত ছুটোছুটি,
রিকশাওয়ালাটার কাছে খুচরো পয়সা নেওয়াই হোল না।
তখনও ট্রেনের কিছু দেরি ছিল তাই আমি "মাস্টার মাস্টার,
নালিশ লেখার খাতা দাও"—
ব'লে তার আপিশে ঢুকেছি।

বিশাল খাতার মধ্যে দ্রুত লিখে ফেলি :
কেন যে ট্রেনেরা রোজ দেরি ক'রে আসে,—ক্ষতি হ
শুধু এই ?
শূন্য গ্যালারির মতো রুলটানা প্রকাণ্ড কাগজ
অথচ এসেছে মাত্র ক'টি মৃদু কথা এক কোণে ;
'ক্ষতি হয়!'
ভেবে একটু লজ্জিত হলাম।
আসলে, নালিশ ছিল যথেষ্ট জোরালো
রেলকর্তৃপক্ষ কিংবা বিধাতা, সমাজ, রাজনীতি
জীবিকা বন্ধুত্ব—সব কিছুর বিরুদ্ধে ছিল বিষম বিক্ষোভ।

অথচ কলম খুললে হিংসা চলে যায়। মনে হয়
ক্ষতি যা হবার তা-তো হয়ে গেছে
ক্ষতি হোল খুব,
নষ্ট সময়ের স্তূপ ভেঙে তবু শব্দ আসে তার,
একেবারে না-আসার চেয়ে সে কি ভালো নয়!

বিশাল খাতাটা পড়ে থাকে—
দেরি করে যে এসেছে, ইচ্ছে করে ভালবাসি তাকে ॥

তোমাকে

"উদ্ধার করো"—তোমাকে বলেছি কবে,
তুমি বলেছিলে, "হবে একদিন হবে,
আপাতত নাও গোলাপের চারা দুটি,
ফুল হলে যদি অনুরূপা-নামে ফুটি।"

বাগান পাই নি, গোলাপ বাঁচে নি মোটে
টব ছিল দুটো, পুঁতেছি রজনী-জুঁই,
এখন সেখানে নিরাপদ ফুল ফোটে—
শাদা ফুলগুলি পাশে রেখে রোজ শুই।

দেখা হয় প্রায়, থাকো তুমি কাছাকাছি,
জেনে যাও, সেই গাছ নেই, আমি আছি।
তুমি বলেছিলে, "হবে, একদিন হবে",
আমি তো প্রশ্ন করি না, "কখন্, কবে?"

এক অদ্ভুত শ্মশানে

আমরা চারজন সেই রাতের অন্ধকারে গিয়ে পৌঁছলাম
এক অদ্ভুত শ্মশানে—
সিমেন্ট-বাঁধানো সিঁড়ি,
কংক্রিটের ব্রিজ লাফ দিয়ে উঠেছে গোল হয়ে, কিন্তু ততক্ষণে
যমুনা সরিয়ে নিয়েছে তার জল।
মৃতদেহ খুঁজতে খুঁজতে আমরা চারজন পেয়ে গেলাম একটা ক্ষীণ সরু চিতা
সম্ভবত কোনো বালকের,—শরীরে যার আগুন লাগে না ;
একজন যুবতী বাকি তিনজন যুবাকে প্রশ্ন করলো :
এই নৃশংসতা তোমরা সহ্য করো ! এই আগুন ঘিরে যাদের ছায়ামূর্তি
তারা কি আত্মীয়, না পিশাচ ?
বললাম : তাহেরে, তোমরা মাটির নিচে শুয়ে শুয়ে পচে যাও,
কী করে বুঝবে এই আগুন মানে কী আরাম। চলো,
জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে তোমায় একটা সিগারেট ধরিয়ে দিই,
দেখবে, কেমন নেশা ধরে যাবে এক টানে।
আসলে, সব নেশাই তো মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু
মৃত্যু, মৃত্যুর দৃশ্য নিজেই একটা প্রচণ্ড নেশা—
না হয়, অপেক্ষা করো কিছুক্ষণ। আমরা চারজন এই ব্রিজের ওপর
একটু ফষ্টিনষ্টি করি, তাস খেলি, তারপর আগুন নিবে গেলে
ওই বালকের নাভি চুরি করে আনবো।
বললাম : মানুষের সমস্ত দেহ পুড়ে যায়—
হাড়গোড়, কংকাল, মাথার খুলি, হৃৎপিণ্ড, অণ্ডকোষ
স্মৃতি বিস্মৃতি, স্বপ্ন ও কল্পনার কৌটো, কিন্তু একটা তৃষ্ণার্ত
নাভিকুণ্ড শুধু জলের জন্য পড়ে থাকে।

বললাম : যমুনা সরে গেছে যাক্, আমরা তো আছি,
বল খেলার মতো পায়ে ঠেলতে ঠেলতে ওটাকে জলে পৌঁছে দেবো
তবে তো বালকের নিষ্পাপ আত্মার বেহেশ্‌ত লাভ হবে।
তাহেরে, আমাদের মধ্যে একজন মাত্র মেয়ে, যুবতী

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো : না, না তোমরা যাবে না আগুনের কাছে,
তোমরা বালকের নাভি নিয়ে লোফালুফি খেলবে না,
তোমরা নিরাপদে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, কথা দিয়েছো।
এই অন্ধকারেও
তোমাদের চোখে কবিত্ব ও নৃশংসতা লিকলিক করছে কেন ?
তোমরা বুঝতে পারছো না, আমারও নাভির চারদিক
একটু-একটু পুড়ছে, জ্বালা করছে। যেন ওই বালকের চিতার কাছে—
কেউ লাটাই ঘোরাচ্ছে আস্তে আস্তে, আর আমি
একটা পড়ে-যাওয়া ঘুড়ির মতো, এই ব্রিজের ওপর ঘষ্‌টাচ্ছি।
দেখতে পাচ্ছো—একটা কালো সুতোয়
আমার আর ওই জ্বলন্ত বালকের মধ্যে টান পড়ছে, প্রচণ্ড !

আমরা তিনজন যুবা হঠাৎ হতবাক। ফষ্টিনষ্টি ভুলে
তাহেরে নাম্নী একজন মুসলমান যুবতীকে
টানতে-টানতে ব্রিজ থেকে সিঁড়ি
সিঁড়ি থেকে রাস্তা
রাস্তা থেকে ট্যাক্সিতে ওঠার সময়
টং করে একটা শব্দ—
আর তাই শুনে চারজনই হাসতে হাসতে
লুটিয়ে পড়লাম ॥

নারী

এ কেমন প্রেম যার অন্য নাম দয়া, উদারতা ?

নাকি যা নারীর কাছে গণনীয় নারীর অধীত
তার মুখ একাগ্র, ব্যাপ্তি অদ্বৈতবিসারী ?
তাই হতভাগ্য শঠ ফেরিওয়ালা পাষণ্ড তঞ্চক
কিংবা লুলা
মসৃণ পায়সে
বঞ্চিত এবং খুশী,—যেমন পাখিরা সরে বসে
জ্যোৎস্না থেকে।
পথে হাঁটতে ব্রাত্যদের অনঘ কফোণি ঠেকে যায়
দু-একটি প্রতীকে, ওরা
নৈবেদ্যের সঙ্গে তুলনীয় কিন্তু আধুনিক মর্মরনির্মিত।

দুধে ও ব্যথায় ভারী ছোট-ছোট স্তূপগুলি অর্পিত কোথায়
না জেনেই ওরা ভাবে—নারী, সব নারী
পরোক্ষপ্রেমিকা, এক, পরিধানে ভিন্ন ভিন্ন শাড়ি।

যে জানে, সে জানে
দিলে সে একজনকে দেবে, অন্যদের কিচ্ছুই দেবে না॥

মনের কথা মনে

গাছের মনে দাঁড়িয়ে গাছ বুকের লোমে হাত বুলোয়
ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে এপাশ ওপাশ,
পাখির মনে পাখি
উড়ে বসলে শরীর নাড়ে, সুড়সুড়ি দেয় হাই তোলে,
পারতপক্ষে তাড়ায় না।

বয়স হচ্ছে। চাঁদির ওপর বেখাপ্পা চুল, ফুলগুলো—
তাই না দেখে লতার মনে লতা
জড়িয়ে ওঠে, মুখের কাছে মুখ।
গাছের মনে দাঁড়িয়ে গাছ বুকের লোমে হাত বুলোয়
শরীর নাড়ে, হাই তোলে,
মনের কথা মনে, ওদের পারতপক্ষে তাড়ায় না॥

প্রকৃতির সঙ্গে

অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল
পরনে হাফ-শার্ট হাফ-প্যান্ট সাদা কেড্‌স্‌
হাতে ছোট ছড়ি, নির্ঝঞ্ঝাট,
প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছেন ; মানে ছ'টা।
চারদিক আলো হয়ে গেছে চমৎকার
ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে—
গরম চা, খবরের কাগজ ;
আর একটা দিন—বহুমূল্য, তাজা, সুগন্ধি
এবং, আমার পিঠের একটা অদ্ভুত ব্যথা ছাড়া, সবটাই নতুন।

ট্রাকটার চালিয়ে চাষবাস করেন প্রেমকৃষ্ণ চৌহান
তাঁর স্ত্রী নন্দিতাও উঠেছেন,
আলগা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এ-ঘর ও-ঘর
আদুরে পুতুলের মতো।
পাশের ঘর থেকে মেয়েকে তুলবেন এবার
সাজাবেন, চুল আঁচড়ে দেবেন লাল রিবন দিয়ে,
তারপর স্কুলের বাস যখন তুলে নিয়ে যাবে,
তিনি হাত নাড়বেন।
আলগা পোশাকের ভেতর তাঁর মসৃণ সুপুষ্ট শরীর
একটু একটু দুলবে। বাতাসে সুগন্ধ। সকাল সাতটা।
আমারও হাত নাড়তে ইচ্ছে করবে এখান থেকে
কিন্তু না,
এই সব মধুর দৃশ্যে আমার দেখার ভূমিকা। আমার পিঠে
একটা অদ্ভুত ব্যথা, যা পুরনো।

অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে কাকেদের শোরগোল।
উঁচু বাড়িগুলো টপকে এ-গাছ থেকে ও-গাছে,

রেলিঙে, ইলেকট্রিকের তারে বসে দুলছে ওরা,
ঠোকরাচ্ছে প্রাতরাশ। আমার মনে হয়
মানুষের বেলা কেন অন্যরকম ?
টাকা-পয়সার ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই
খাবার জিনিসগুলো কারো-কারো মুখের কাছে
ইয়ো-ইয়োর মতো নাচে ;
ওই সব নধর আলু পেঁয়াজ ফুলকপি ও টম্যাটো
নিজেদের গরজে কেন উঠে আসবে মাঠ থেকে,
সাইকেলে; ঠেলাগাড়িতে, ঝাঁকার ওপর বসে
কেন চীৎকার করবে হাত তুলে :
আমাকে নাও, ভাজো, সিদ্ধ করো, খাও
তোমাদের দোহাই।

মানে আটটা। সকালের ঘোর কাটছে।
চোখের সামনে খাদ্যদ্রব্য ঘুরঘুর করতে দেখলেই
আমার টাকা-পয়সার কথা মনে পড়ে যায়
আর সমস্ত শরীর রী-রী করে ওঠে—
পিঠের ব্যথাটা বেড়ে যায় দশগুণ।
মনে পড়ে যায়, আমার সময় হয়েছে এবার।

আসল ব্যাপার কাউকে বুঝতে দেবো না—
চটপট পরে ফেলবো
মাজা পোশাক, পালিশ-করা জুতো,
চাঁচা গালের ওপর আফটার-শেভের পরুষ গন্ধ ; এক সময়
রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো ঢুকে পড়বো সেই অপূর্ব বন্দিশালায়
যার নাম জীবিকা,
'জীবন' ও 'বিকার' শব্দ দুটির সমন্বয়ে যে-প্রতিষ্ঠানের নামকরণ,
যার অভাবে দেশের অসংখ্য যুবক
হা-হুতাশ করছে।

এক অদৃশ্য প্রভুর নির্দেশে আমরা
লুডোর ঘুঁটির মতো কামড়াকামড়ি করি সেখানে,
সেইটেই কাজ,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লান্ত।
কেউ জিতবো না, কেউ হারবো না শেষ পর্যন্ত,
শুধু আমাদের ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে-পড়া রক্ত ও ভয়
প্রকাণ্ড শিশিতে জমে উঠবে।
সেদিনের মতো খেলা শেষ হলে প্রভু স্বয়ং
মুখোশ পরে দাঁড়াবেন
আদেশ করবেন : সোজা হয়ে দাঁড়াও, প্রাণ খুলে হাসো।
তারপর প্রত্যেককে কিছু কিছু পারিশ্রমিক দেবেন।
প্রাপ্তির আনন্দে ভুলে যাবো সব নির্যাতন।

সন্ধের পর কোনোদিন যানবাহন পাওয়া যায় না
এত ভিড় এত শব্দ এত ক্রুদ্ধ ও কৃতজ্ঞ জনতার কোলাহল,
মাথার যন্ত্রণা।
যেদিকে তাকাও পুঞ্জীভূত জঞ্জাল, নালিশ, থুতু ও অপমান।
মেরেমারখেয়ে মেরেমারখেয়ে মেরেমারখেয়ে একা
আমার মধ্যেকার ছোট ছোট তারগুলো সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে—
অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল বা নন্দিতা চৌহানকে তা বোঝানো যাবে না

এমন কেউ একবার হাজির হন না সামনে
যাঁর আদেশে
(আদেশ ছাড়া আমরা তো মানি না অন্য কিছু)
প্রথমেই তুলে দেওয়া হবে টাকা-পয়সার ব্যবহার,
যা অধর্ম শিখিয়েছে,
বাতিল করে দেওয়া হবে জীবিকা :
'জীবন' ও 'বিকার' শব্দ-দুটির সমন্বয়ে যার নামকরণ।

যাঁর হুকুমে উদার আলু ও পেঁয়াজ
হৃদয়বান ফুলকপি ও রূপসী টম্যাটোকে আর আত্মবিক্রয় করতে হবে না।
কাদা ভেঙে আমরা সকলে যাবো তাঁদের কাছে,
সেবা করবো, সমাদর করে ডেকে আনবো।
কামড়া-কামড়ি যদি করতেই হয়, করবো
বেচারা মানুষদের সঙ্গে না, বাইরে, বিমুখ ও উর্বর প্রকৃতির সঙ্গে॥

কাঁটাকে

নিজের হাতে গাছ পুঁতেছি, নিজে দিলাম জলটা
বাবলা বলো—অ্যাকেশিয়া—ফল ফলেছে, ফলটা
নড়তে-চড়তে বেঁধে, কিন্তু বেঁধাটা নয় যুদ্ধ
মুঠোয় কাঁপে, রক্তে ভাসে ফলটা মুঠোসুদ্ধ!
পরস্পরের স্পর্শ মাখা—গ্রীষ্মে যেন পশমি,
এ-আরাম নিজস্ব, প্রিয়, ভালোবাসার রশ্মি।

সত্যি, আমার কষ্ট হয় না, হলফ করে বলছি—
নিজের ভেতর গাছ উঠেছে, দেখবে কেমন ফলছি?
ফল না, হাতে গোলাপ কুঁড়ি—তোমায় দেবো, ইচ্ছে,
পাঁজরা ফুঁড়ে বেরোও কাঁটা, মনটা নাড়া দিচ্ছে।

নিমিত্ত

মালাটা তুমিই পরো।

আসলে তোমারই জন্যে এই
উৎসবের উদ্যোগ হয়েছে,
আমি শুধু শব্দ আর প্রতীক সাজিয়ে
প্রদীপ জ্বেলেছি মাত্র

মালাটা তুমিই পারো,
যে-হেতু তোমার পাশে থেকে
পেয়েছি দুঃখের পাঠ—
ফুলেল তেলের গন্ধে বিষণ্ণ হয়েছে অভ্যন্তর।
বাকি সব
শব্দ আর বাক্যবন্ধ অযত্নে সাজানো।

মালাটা তোমার প্রাপ্য, তুমি পরো,
আমি চেয়ে দেখি ॥

ছুটির বিকেল

শিশুটি দুরন্ত, ওকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা মায়ের কর্ম না।
অসংখ্য নালিশ জমে প্রত্যহ,
তারিখ পড়ে
রবিবার
শুনানি, বিচার।

বাদী চুপ, আসামী ভ্রূক্ষেপহীন ;
রবিবারে তার
সবচেয়ে বেশি ছুটোছুটি।
বিচারের জন্যে যদি সামান্য প্রস্তুতি
না থাকে, শুনানি হয়?

সুতরাং
সমস্ত দরকারি কাজ পড়ে থাকে ছুটির রোদ্দুরে,
ছুটির রোদ্দুর পড়ে বিছানায়,
শিশু ও জননী ফেরে নাগালের মধ্যে, পাশাপাশি,
রান্নার ঘ্রাণের মতো।
দুপুর গড়িয়ে যায় কোন্ ফাঁকে ; অন্তর অলস
বিচারক—
বিকেলের ঠোঁটে গাঢ় হয়ে ওঠে স্নেহ।

বাহিরে রাস্তায়
ছেলেরা ক্রিকেট খেলে তখন, অতিথি ফিরে যায়॥

তবু কেন আমিই প্রথম

যাবার সময় তুমি জানিয়ে গেলে না।

আমি কেন কথা বলি ?
আমি কেন কথা বলি !
আমার গলায় ঢিল উঠে আসে বারবার
অথচ পাথর মুখ চেপে ধরে
চেপে ধরে চোখ ;
আমি কেন কথা বলি ?   আমি কেন তোমাকে আবার
এ-শহরে আসবার
নিমন্ত্রণ করি ?

যাবার সময় তুমি কী অবলীলায় চলে গেলে
কেন গেলে, জানিয়ে গেলে না।
যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়
যদি কোনো শোক···
না হোক, না হোক।

এমন ত্রিপল-ঢাকা আমার শরীর
ছুঁলে পর বিষম কর্কশ,
অথচ গলায় ঢিল উঠে আসে বারবার।
তবু কেন,
তবু কেন আমিই প্রথম কথা বলি !

ওরা ঝুঁকে ছবি আঁকে

কোথা থেকে এল ওরা, কেন আসে ?
হাতে টিফিনের বাক্শ, এক ঝাঁক শিশু—
মাঠ ভরে যায়
ঘাস হয় উজ্জ্বল রঙিন ?
ওরা ঝুঁকে ছবি আঁকে—
বাবা-মা'র-মুখ নয়, সমুদ্র পাহাড় বৃক্ষ
যা কিছু বিশাল।
বামনপ্রতিম দেহে কী করে যে ওরা
আকাশের মন ধরে রাখে !

অথচ ওদের জন্ম যে-কোটরে
সেখানে শুয়েছে কত ফ্যাকাশে রমণী
শরীরে রোমশ ছায়া, অকাতর,
এপাশ ওপাশ ;
সে-কোটরে সারা রাত
অ্যালুমিনিয়মে দাঁত ঘ'ষে ধার করে ইঁদুরেরা ॥

একান্ত

"কবি হে, তোমাকে বড়ো প্রয়োজন
কথনও সময় পেলে দেখা করে যেয়ো
কথা আছে।"
টিলার ওপরে দূরে লাল বাড়ি
উঁচু গাছপালা ঘেরা, তার
ভৃত্য এসে পত্রটি দেখালো।
ও-বাড়িতে কতগুলো ঘর, কারা থাকে,
কী করে সমস্ত দিন, হাসে কি না,
কিছুই জানি না—
নগণ্য কবি তো কারো প্রয়োজনে লাগে নি কখনো।

তবে
কবিনামে কে পত্র পাঠালো ?
কে ওই স্বপ্নের মহল থেকে ডাক দিল
জানতে ইচ্ছে হয়,
সে কি পুরুষ না নারী,
সে কি বৃদ্ধ না অশান্ত কিশোর ?
যে-ই হোক
আমি তো এক্ষুণি তার সব কাজ করে দিতে প্রস্তুত রয়েছি

তবু ভয় করে :
দেখা হলে যদি সে চিৎকার করে ওঠে,
বলে, "চোর,
তুমিই সিন্দুক থেকে নিয়েছ মোহর।"

সবচেয়ে নিচু কলটির

শতবার ঠেকে-ঠেকে তবু তুমি সঞ্চয়ী হলে না।

যখন অজস্র ঝরে বাতাস, পানীয় জল
আনন্দের স্বরূপ ফোয়ারা

তুমি অপচয় করো সব :
পা ধোও অমৃতে দুধে,
উচ্ছিষ্ট কুলকুচো করো দক্ষিণের অমল বাতাসে,
যার একবিন্দু পেলে জিহ্বার জড়তা কাটতো
পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে ভেসে যেতে দাও সেই রক্তিম আসব।

এখন এ-মধ্যযাম, দুঃসময়, নির্ঝরবিহীন,
তোমার সঞ্চয় নেই কোনো।
যেখানে স্নানের জন্য মাথা রাখবে, কলের খক্-খক্ শব্দ
ঠাট্টা করে জানাবে শুষ্কতা,
আকাশ শবের মতো স্থির।
তুমি কি তৃষিত ? তবে সবচেয়ে নিচু কলটিব
কাছে যাও,
সবচেয়ে নিচু কলটির কাছে হাঁটু মুড়ে বোসো
দু-হাতে অঞ্জলি মেলে দাও॥

প্রাতরাশ

ঠিক এই সময়ে পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও
একটা দুর্ঘটনা ঘটছে।
টোকিও না আলজিরিয়ায়,
কোনো কয়লার খাদে
না গঙ্গার ওপর মানুষ ভর্তি একটা নৌকোর ওপর,
আমি বলতে পারবো না,
কাল খবর-কাগজে বড়ো-বড়ো অক্ষরে সে সংবাদ আপনারা পড়বেন।

অঙ্কের মতো নির্ভুল নিয়ম পৃথিবীর—
আমরা তো জেনে গেছি।
আমরা টালমাটাল হয়েও সামলে চলি তাই,
কিন্তু কয়েকটা তালকানা মানুষ থাকে, যারা
বোকার মতো ঘুরতে-ঘুরতে
সেই ভুল কাউন্টারের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়—
হাতে ভুল স্টেশনের টিকিট,
চোখে আকাঙ্ক্ষা ও ভয়।
তারপর ভেঙে পড়ে ছাদ, বন্যা আসে হঠাৎ,
কারো বন্দুক থেকে ছিটকে বেরোয় গুলি, কিংবা
বিষণ্ণ পাখির মতো ভুশ করে আত্মহত্যা করে এরোপ্লেন।

আর অমনি খবর ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র :
হয়েছে, হয়েছে একটা দুর্ঘটনা, যা অঙ্কের বাইরে, যা অতর্কিত।
শিকারীর মতো ওৎ পেতে বসে-থাকা সাংবাদিক
একটা খবর পেয়ে যায়, রাত-জাগার একটা মানে :
জ্যান্ত মানুষদের চায়ের টেবিলে দেবার মতো একটা উত্তেজক খাবার
কয়েকটা মৃত্যু, প্রতিদিন॥

মূর্তি, এবার

প্রথম আঘাত
তুমি কথা রাখো নি ব'লে,
দ্বিতীয় আঘাত
তুমি কথা রাখো নি ব'লে,
তৃতীয় আঘাত
তুমি কথা দিয়েছিলে কেন ?

মূর্তি,
এবার নিজে-নিজেই ভেঙে পড়ো
বেদীর চারদিকে।
দেরি করলে
আমি যে ভেঙে পড়বো ॥

অপরাধ

পাপ বলে কিছু নেই, অপরাধ আছে
যা কষ্টদায়ক।
আছে পুণ্য অর্থাৎ আনন্দ।
পুণ্য তো করেছি ঢের,
অপরাধ দুটো-একটা।

দিন গেলে পুণ্যেরা শুকোয়
বাসি বকুলের মতো।
অপরাধই
মাধবীলতার মতো বেড়ে ওঠে
পিঠ থেকে কাঁধে :
একদিন ফুল ফোটে সে-লতায়
গন্ধে তার
কোথাকার পাপপুণ্য সব একাকার হয়ে যায়॥

খেলা

আমাদের ঘরকন্না খেলা-খেলা—
প্রায় তাই।
শরীরটা সুস্থ থাক্, সুস্থ রাখো
তারপর যা কিছু ঘটনা
বহে যাবে পাতার ওপরে ঠাণ্ডা বাতাসের মতো।
আসলে, সংসার করা মানে
একসঙ্গে বুড়ো হওয়া, ঠিক তাই নাকি ?

ও বলে, তা ছাড়া আরো আছে।
কী রকম ?
সে তুমি বুঝবে না।   দাঁড়ি।
আমি চুপ করে যাই, ভাবি,
খেলতে-খেলতে হারালাম নাকি একটা আলমারির চাবি ?

খুশী

রোজ সকালে বেরিয়ে এসে দেখি
বারান্দায় ছুটো খবরের কাগজ
আর একটা চিঠি।
চিঠিতে : "আজও এলাম,
তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যাই।"

এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি—কই
কেউ নেই।
শুধু উপুড় রাস্তাটার পিঠের ওপর
শীতের ফুলকাটা শালের মতো
রোদ পড়েছে ॥

শব্দ

অনেক রাত অবধি কালি ফিরি করে ব্যাং ও শেয়াল
আমরা যে-যার ঘুম ও সম্পর্ক গাঢ় করে নিই,
ওরা চলে যায়।

এক জোড়া কাক ও মোরগ
জানলা গলিয়ে ঢুকে পড়ে কোন্ ফাঁকে
উটের গ্রীবার মতো ;
মশারির ছোট ছোট শূন্যগুলো
ঠুকরে সাবাড় করে দেয় বেমালুম।
চোখ চেয়ে দেখি
চারটে খুঁটে বাঁধা, ঝুলছে
ফর্শা সোচ্চার আর একটা দিন।

অথচ, মাঝখানে, ঘুমের মধ্যে
কোথায় যে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ
স্টীমারের ভোঁ—
আমি বুঝতে পারি না।

নিমন্ত্রণ

নিজের বাগানটা নিয়ে দিন কেটে যায়।

ঘুরে ঘুরে জল ঢালি মূলে
কামড়ে ধরা মাটি খুঁড়ে ঢিলে করি, দিয়ে দিই আরাম,
ওপ্‌ড়াই পরগাছাগুলো
ছেঁটে ফেলি যত মরা পাতা—
তা না হলে নিশ্চিন্ত সহজে পাপড়ি মেলে না ফুলেরা।

এ বছর ফুটেছিল অঢেল গোলাপ
কী তাদের রং!
মস্ত খোঁপাসুদ্ধ মাথা নেড়ে চন্দ্রমল্লিকা ডালিয়া
প্রশ্ন করেছিল আমি খুশী কিনা।
এখন ফুটেছে জুঁই—এক ঝাড় নক্ষত্র বাগানে।
নিজেদের মনে ওরা ফোটে
আমি দেখে নিলে ঝরে যায়।

একদিন চলে এসো, দেখে যাও বাগানটা আমার,
না না, সে কি, আমার ফুলের দলই তোমাকে দেখুক।

পথিক

খানাখন্দ ইতস্তত, সর্বত্র বন্ধুর,
কোথাও অস্ত্রের চিহ্ন, ক্ষত জায়মান।
রৌদ্রে গলে, জ্যোৎস্নায় ভেজে না,
পায় না বৃক্ষের ছায়া—সুগন্ধি রুমাল—বৃক্ষ বিনা।
তবুও আমরা হাঁটি, হেঁটে যাই, হোঁচটে ঠোকরে
বুঝি, বাঁচা কি কঠিন!
ক্রুদ্ধ হয়ে কখনো বা নিজেদের অস্তিত্ব জানাই,
সোডার বোতল ছুড়ি, কাচ ভাঙি—
আবার কখনো
নিজস্ব রত্নটি মুক্ত ক'রে
জল ঢালি সমবেদনায়,
ভিখারীর কোলে শোয়া উদাস শিশুর মতো দেখি
কলকাতার পথ এই, আমাদের অসুস্থ জীবন।

ঘৃতকুমারীর মতো কিছুটা অ্যাস্‌ফল্‌ট
কিছু সেক বাষ্পীয় রোলারে
দেবে কোন্ পৌরপিতা
পিতৃপরিচয়হীন সন্তানসঙ্ঘকে ?

দরিদ্রনারায়ণ

বিশ্বের ধুলো কাদা কাঁকর ছড়ানো রইল বিশ্বে,
জুতোয় মুড়ে নিয়েছি পা।
চলতে লাগলো ঘুমন্ত রক্তস্রোতের ওপর মশাদের টুইস্ট নাচ
আমরা টানিয়ে নিয়েছি মশারি।
এইভাবে সরে সরে এসে
গড়ে তুললাম সভ্যতা।

বোধ হয় ভুল হয়ে গেছে কোথাও।
রেস্তোরাঁর নীলচে আলোয় শাদা বাটির মধ্যে
তোমার প্রতিবিম্ব, না, ওটা কোনো পাখির অভিমানী চোখ ?
ধূমায়িত অন্নের অন্তরালে, বলো তো, ও কার বিক্ষুব্ধ মাংসখণ্ড ?

বাইরে অপেক্ষা করছেন দরিদ্রনারায়ণ।

কী টশ্‌টশে তোমার ঠোঁট,
কী লোভনীয় তোমার জিভ,
কী নশ্বর সুন্দর তোমার শরীর ;
এখনও ভয় করে না ?

বাইরেই অপেক্ষা করছেন দরিদ্রনারায়ণ :
এক চোখ অন্ধ, এক হাত চিৎ করে পাতা ;
চাদরের তলায় অন্য হাতটা লুকোনো।

হে শাসক

প্রথমে সর্বস্ব কাড়ো, কেড়ে নাও যা আছে সম্বল—
অতুষ্ট কৃতঘ্ন যতো মুখাপেক্ষী জনসাধারণ
ওরা একবার জানুক
নিঃস্ব হওয়া কা'কে বলে, যথার্থ নগ্নতা কা'র নাম।
বড়ো দীর্ঘকাল ওরা নিরাপদ নিঃশঙ্ক রয়েছে।

যখন শহরে গ্রামে, কারখানার ধূমল আকাশে
মুছে যাবে প্রতিরোধ,
জেগে উঠবে, দন্তহীন আর্তনাদ, কান্নার কোরাস :
'দাও দাও' করুণ প্রার্থনা—
তখন ওদেরই শস্য বস্ত্রখণ্ড সিঁদুর-মাখানো সিকি, টাকা
ছুড়ে দিও টুকরো ক'রে, হে শাসক, দেখো
লক্ষকণ্ঠ উল্লাসে হৈ হৈ করে উঠবে—'জয়,
জয় তব বিচিত্র আনন্দ জয় তোমার করুণা !'

ভাবনা

শান দেওয়া কোদাল আর গাঁইতি
আকাশের দিকে তোলা
ওরা খুঁড়ছে আর খুঁড়ছে।
খুঁড়ছে মাটি, রাস্তা, মানুষের অন্তঃকরণ
কিছু একটা তৈরী করার জন্যে।
কত কাল চলে আসছে এই খোঁড়াখুঁড়ি
কিছু একটা গড়ে উঠলো না।

মুণ্ডু কাটা গুঁড়ির বেঁটে ছায়ায়
বসে থাকে লোকটা
আর এই সব ভাবে।

বাঁশের খাঁচায় পোষা মিথ্যেবাদী ময়না
সামনে থাক্ দিয়ে সাজানো মানুষের ভাগ্যলিপি।
মানুষজন আসে যায়, কিন্তু ও
অপেক্ষা করে থাকে :

খুঁড়তে-খুঁড়তে একদিন
লোকগুলো নিজেরাই পড়ে যাবে গর্তের মধ্যে,
তখন
ছুটে গিয়ে টেনে তুলবে ওদের,
না, উঠে গিয়ে মাটি চাপা দেবে।

বন্‌সাই

অমল কিশোরী ছিলে, কী করে রয়েছো আজও তাই
আগেকার মতো—ঠিক অন্তরে অক্ষত, বন্‌সাই ?
তুমি জানো, তুমি তো নিশ্চিত জানো বিশ্ব কী দুঃসহ।
হিংসায় উন্মত্ত, ঊর্ধ্বমূল, তবু কী প্রলোভে রহ
কোকুনের মতো ক্ষীণ, ক্লেদস্রোতে বিশুদ্ধ বুদ্বুদ ?
জ্যোতির্ময়পাত্রে তুমি গোপন সত্যের মতো দুধ
যদি হও, হয়ে থাকো, কে তোমায় উপলব্ধি করে
ধন্য হবে ! বরং সূর্যকে ডাকো ঢাকনা তুলে ধরে।

নিজেকে অর্পণ করো এখানে রোদ্দুরে : চুল খোলো,
চিৎ হয়ে টেবিলে শোও, নাও জোরে নিশ্বাস, পা তোলো-
দেখাও বৈদ্যকে যা-যা আছে ভুল।
কেটে দেবো জাল
অমল কিশোরী তুমি নারী হবে। তোমাকে বিশাল
অধিকার নিতে হবে অর্কিড-সংকুল মহাদেশে।

অনেক চাই, বন্‌সাই, বেদনা চাই শেষে ॥

অবাধ্য বালক

কী করছে ওখানে বসে মলয়
বা মলয়ের মর্মর ফলক ?
রোদ খাচ্ছে শীতে ?
নাকি তার রেখাশূন্য শাদা হাত
আমাদের বোঝাচ্ছে ইঙ্গিতে—
আয়ু যশ ভাগ্য বলে কিছু নেই
আছে ক্রোধ
উজ্জ্বল, নির্বোধ।
আর আছে প্রতিহিংসা—
দমিত রক্তের জন্য দমিত রক্তের তৃষ্ণা।
বলছে : "ওহে ভদ্রলোক,
প্রতিদিন ক্ষৌরী হও
প্রতিদিন উখো দিয়ে নখ
করেছ মসৃণ, করো, উল্‌টোনো বঁটির মতো থাকো
কাৎ হয়ে
বৃদ্ধ জরাগ্রস্তদের মধ্যে আমি অবাধ্য বালক
চন্দ্রবিন্দু নিয়ে খেলা করি।
উনিশ-শো-পঞ্চাশে জন্মে উনিশ-শো-সত্তরে
তোমাদের ঘৃণা করে মরি।"